Prajñābāridhi : Journal of Multidisciplinary Research
Journal Homepage - https://www.collegetsm.in/college-journal/

ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার রূপরেখা

সঞ্চিতা মাজি
স্যাক্ট-২, ইতিহাস বিভাগ
তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়, তেহাট্টা, পূর্ব বর্ধমান
ইমেল : sanchitamaji8@gmail.com
দূরাভাষ : ৯৬৩৫৮৯২৪৬২

সারসংক্ষেপ :

একটা দেশের সমাজ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হল সেই দেশের নারী শিক্ষা। বর্তমানকালে একটা ধারণা প্রচলিত আছে সেটি হল একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে একটি ব্যক্তি শিক্ষিত হবে আর একজন নারী শিক্ষিত হলে তার সমগ্র পরিবার শিক্ষিত হবে। অর্থাৎ নারী শিক্ষার মাধ্যমে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে. প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীরা যথেষ্ট সম্মানীয় স্থানে অবস্থান করতেন। সেই সময়কার অনেক নারীর পরিচয় পায় যারা জ্ঞানে গুণে সমাজে প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল। এই সময়কার নারীদের বেদপাঠে অধিকার ছিল তারা যজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু কালের চক্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। বিদেশি শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা খর্ব হতে থাকে, নারীর প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব গড়ে তোলা হয়। নারী শিক্ষায়ও এর প্রভাব পড়ে। ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টান মিশনারীরা এসেছিল। নারীশিক্ষা বিস্তারে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া নারী শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতার পর যে সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছিল সেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকার কথা বলা হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য স্বাধীনতার পর কমিশন ও কমিটিগুলির গঠিত হয়েছিল তারা সুপারিশ করেছিল।

শব্দসূচক : নারী, শিক্ষা, ভারতবর্ষ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে দেশ যত উন্নত সেই দেশের নারী শিক্ষার ওপর তত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই নারী শিক্ষা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে আবার কোনো

কোনো ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়েছে, ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার রূপরেখা বুঝতে গেলে প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে নারী শিক্ষা কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রাচীন যুগ বা বৈদিক যুগের নারী শিক্ষা :

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিভিন্ন যুগের সমাজে নারীর মর্যাদার উন্নতি বা অবনতি যাই হোক না কেন নারীর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি কিন্তু অব্যাহত ছিল।

বৈদিক যুগের নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ঋকবেদে বিভিন্ন স্তোত্রে দেখা যায় ঋকবৈদিক সমাজে পুত্রসন্তানের কামনা করা হলেও, কন্যা সন্তানের জন্ম হলেও তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হত না। এই যুগের নারীরা বৈদিক স্তোত্র রচনা করতে পারতেন। ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারার মত বিদুষী নারীর কথা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায়। আমরা যদি বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রত্যক্ষ করি দেখব জনক রাজ্যে, রাজা বিদেহর রাজসভায় গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে তর্কবিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল সেইখানে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাজিত করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরা বেশ উঁচু স্থানে অবস্থান করেছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেলেও নারী শিক্ষা ভালো ভাবেই প্রচলিত ছিল। এই যুগের অনেক নারী বিবাহের আগে পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করতে পারতেন। আবার অনেকে সারাজীবন বিবাহ না করে ধর্মদর্শন চর্চা করতেন এদেরকে 'বক্ষবাদিনী' বলা হত।

মহাকাব্যের যুগেও নারীশিক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই যুগে নারীরা শুধুমাত্র দর্শন, তর্কশাস্ত্র নয় এমনকি সমরবিদ্যাতে শিক্ষা গ্রহণ করত। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসন কালে আমরা চিত্রাঙ্গদার নাম পাই যিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। এছাড়াও আমরা বৈদিক যুগে সমরবিদ্যায় দক্ষ এমন কয়েকজন নারীর উল্লেখ পাই। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুদ্‌গলানী যিনি ইন্দ্রের তীরের ন্যায় তীব্র গতিতে রথচালনা করে যুদ্ধ জয় ও ধন আরোহন করেছিলেন। বৈদিক যুগের বীর নারী বিশপলা যুদ্ধে তার একটি পা হারান।

মৌর্যযুগে শিক্ষিত নারীরা রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করতেন। সমকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন বহু নারীর উল্লেখ আছে যারা লিখতে, পড়তে ও সংগীত রচনা করতে পারতেন। পাণিনি বলেছেন যে এই যুগের নারীরা কঠ উপনিষদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। যাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছিল তাদের 'কল্পী' বলা হত। গুপ্ত যুগের নারীরাও কাব্যচর্চা করত এই থেকে তাদের শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাৎসায়ন শিক্ষিত নারীদের উল্লেখ করেছেন। গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্ত মত কাশ্মীর, উড়িষ্যা নারীরা ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতেন। তবে এই যুগে দরিদ্র নারীদের শিক্ষার তেমন সুযোগ ছিল না।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন স্পষ্টত সংঘটিত হতে থাকল তার প্রবাব নারীর শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা গেল। মনুর যুগ থেকে নারী শিক্ষায় অবনতি দেখা গেল। বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ নারীদের ওপর কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হল। মনুর বিধান অনুযায়ী কুমারী অবস্থায় কন্যারা থাকবে পিতার অধীন, বধূ অবস্থায় থাকবে

স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। নারীর স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকল না। তা স্বত্ত্বেও রাজপরিবারের মেয়েরা তখনো শিক্ষার সুযোগ পেত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় কাব্য শিক্ষা, গৃহকর্ম শিক্ষা, সংগীত, কলা, অঙ্কন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তাদের দেওয়া হত।

মধ্যযুগ বা ইসলামিক যুগে নারী শিক্ষা :

ইসলাম ধর্মে মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু গোড়া মুসলমানগণ নারীশিক্ষাকে সমাজের পক্ষে হানিকর বলে মনে করত। তবুও মুসলমান শাসকগণ এবং মণীষীগণ নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতেন যথেষ্ট। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ নারী শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন হওয়ায় নারীশিক্ষা অনেকখআনি সংকুচিত হয়। তবে ধনী ও অভিজাত পরিবার ও নবাব পরিবারগুলিতে মেয়েরা ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত। অনেক সময় হারেমগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হত মেয়েদের জন্য।

মধ্যযুগে নারীশিক্ষা বিকাশের জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্দরমহলে মেয়েদের পঠনপাঠন করতে হত। তারা ঘরে বসেই কোরান পাঠ করতেন। মধ্যযুগে অন্দরমহলে শিক্ষার জন্য উলেমা এবং চারুকলা শিক্ষার জন্য ওস্তাদ নিয়োগ করা হত। রাজপরিবারে মহিলাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষিকা নিয়োগ করা হত।

তাস্বত্ত্বেও আমরা কিছু শিক্ষিত নারীদের নাম মধ্যযুগে উল্লেখ পাই। সুলতানী যুগের একমাত্র নারী শাসিকা সুলতানা রাজিয়া খুব শিক্ষিত ছিলেন। বাবরের মেয়ে গুলবদন বেগম ‘হুমায়ুননামা’ নামক জীবনচরিত রচনা করেছিলেন এবং তাঁর নিজের একটি গ্রন্থাগার ছিল তাতে প্রচুর গ্রন্থের সম্ভার ছিল। বাবরের আর এক নাতনি গুলরুখ খুব প্রতিভাবতী সাহিত্যিক ছিলেন। আকবরের মা হামিদা বানুও পণ্ডিত মহিলা ছিলেন। আকবরের ধাত্রীমাতা মহম আনাগা শুধু যে বিদুষী ছিলেন তা নয়, তিনি একটি উচ্চবিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। জাহাঙ্গীর পত্নী নুরজাহান আরবি ও ফারসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নিয়মিত সাহিত্য চর্চাও করতেন। শাহজাহানের পত্নী মমতাজ বেগম ফারসি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এবং কবিতা রচনা করতেন। শাহজাহানের বড় মেয়ে জাহানারা বেগম দুটি জীবনী লিখেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের কন্যারা সকলেই বেশ সুশিক্ষিত ছিলেন। তার বড় মেয়ে জিরুন্নেষা ফারসি ও আরবিতে সুদক্ষ ছিলেন। তার আারো দুই কন্যা বদরুন্নেসা এবং জিনাতুন্নেসা কোরান মুখস্থ করেছিলেন এবং স্মৃতি থেকে পাঠ করতেন। এই থেকে দেখা যায় সুলতানি যুগ ও মোঘল যুগের নারীরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। নারী শিক্ষা অভিজাত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অভিজাত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার প্রচলন কিছুটা ছিল, কিন্তু আকবরের মতো উদার শাসকরা হিন্দুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। হিন্দু ধনী ও অভিজাত পরিবারগুলিতে মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রচলন ছিল। মীরাবাঈ এবং চন্দ্রাবতী কবি ছিলেন। গন্ডোয়ানা রাজ্যের হিন্দু রাণী দুর্গাবতীও সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সময় আহম্মদনগরের চাঁদ বিবি নামে বিদুষী ও বীরাঙ্গনা মহিলারও উল্লেখ আছে।

সমকালীন সাহিত্য থেকে আমরা তখনকার নারী শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাই। ধর্মমঙ্গল কাব্য কবিকঙ্কন রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে জানতে পারি মেয়েরা তখন সংগীত ও নৃত্যকলার চর্চা করত। পরবর্তী সময়ে মুসলিম সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র রক্ষার তাগিদে মেয়েদের শিক্ষা নানা সংস্কার ও কুসংস্কারের নীচে সম্পূর্ণ রূপে চাপা পড়ে যায়।

আধুনিক যুগের নারী শিক্ষা :

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারী সমাজ যথেষ্ট সম্মানীয় স্থানে ছিল. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিল – এর প্রভাব পড়ল নারী শিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থানের ওপর।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতীয় শিক্ষার ১৬০০ খ্রি: থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। কারণ সেই সময় ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন হয়। এই কোম্পানির হাত ধরে খ্রিষ্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে। এই মিশনারীরা নারী শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শিক্ষার ইতিহাসে হেজেস্ গার্লস স্কুল উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত মিশনারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটিই প্রথম মেয়েদের স্কুল। যদিও এই স্কুলটি স্থায়ী হয়নি। এরপর ১৮১৯ খ্রি: উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও ১৮২০ সালে ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ১৮টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এইসব বিদ্যালয়ে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সেলাই শেখানো হত।

বোম্বেতে প্রথম নারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় নারী শিক্ষা কেন্দ্র গঠিত হতে লাগল। ১৮৩৫ সাল নাগাদ অবিভক্ত বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গাতেও নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। এইসময় নারী সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এই নবজাগরণের সময় বেশ কিছু ভারতীয় নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাই সামিল হতে দেখা যায়। যেমন বাংলায় রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন। এই সময় বাংলার বাইরেও নারীশিক্ষা বিস্তারে একই চিত্র দেখা গিয়েছিল।

প্রথম দিকে শিক্ষা বিস্তারে খ্রিষ্টান মিশনারীরা উদ্যোগ নিলেও, ব্রিটিশ সরকার বিশেষ উদ্যোগ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নেয়নি। ১৮১৩ খ্রি: চার্টার অ্যাক্ট পাশ হল এখানে বলা হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচের জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা বলে। এর ফলে বহু শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। মেয়েদের জন্যও কিছু শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রি: মেকলে মিনিট ও পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় ও উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান প্রবর্তনের যে সূচনা করেছিল তাতে নারী শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল বলা যায়। ১৮৫০-এ তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তিনি সরকারকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার কথা বলেন। ১৮৫৪ খ্রি: উডের ডেসপ্যাচের প্রতিফলন দেখতে পাই। উডের ডেসপ্যাচে প্রথম নারী শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার কথা বলা হয়েছে।

একজন ইংরেজ সমাজ সংস্কারক ছিলেন মিস মেরী কাপেন্টার। তিনি বেশ কয়েকবার ভারতে এসে ছিলেন। তিনি মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। ১৮৮২ সাল নাগাদ বেশ কিছু নারী শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ বা মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই সময়কার দুইজন মহীয়সী মহিলা হচ্ছেন চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

সরকারী তরফ থেকে ১৮৮২-৮৩ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন নারী শিক্ষার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছিল। এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মেয়েদের ডাক্তারি পড়বার জন্য সুযোগ খুলে যায়। মহিলাদের ডাক্তারি শিক্ষার জন্য একটি তহবিল গঠিত হয় যার নাম 'লেডি ডাফরিন ফাণ্ড'।

১৯০৪ খ্রি: লর্ড কার্জন নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের জন্য অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কেরন। অধিক সংখ্যক স্কুল পরিদর্শিকা নিয়োগ করেন, শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ১৯২১-২২ সালের মধ্যে মেয়েদের জন্য বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন মেয়েদের জন্য ৬৭৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯টি মহাবিদ্যালয়, ২১,৯৫৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে বেসরকারি উদ্যাগে বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

১৯০৫-১৯২০ খ্রি: মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দরা নারী শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে এসেছিল। ১৯০৪ খ্রি: শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় বারাণসীতে মহিলাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নারী শিক্ষার অগ্রগতির পর্যায় ছিল ১৯২১-১৯৪৭ সালের মধ্যে। এই সময় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছিল। স্বাধীনতার পর সরকারি তরফ থেকে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর আমরা যদি ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী আমরা দেখি যে ভারতবর্ষে স্বাক্ষরতার হার ৬৫%। পশ্চিমবাংলায় স্বাক্ষরতার হার ৬৮.৮৪%। বর্তমানে সারা ভারতে নারী শিক্ষার হার ৫৪%, সেই তুলনায় পুরুষ স্বাক্ষরতার হার অনেক বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য সমাজে মেয়েদের পিছিয়ে রেখেছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রাচীন যুগ থেকে নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন করেছিল। কিন্তু যত সময় এগিয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তবুও বর্তমান কালে আমাদের সংবিধানে নারী ও পুরুষদের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং সমাজে নারীর মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেক সময় পরিবারে ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়। প্রথাগত শিক্ষা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। এর মূল কারণ অশিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষাই ফেরাতে পারবে নারীর মর্যাদা। একজন নারী শিক্ষিত হলে তার সমগ্র পরিবার শিক্ষিত হবে।

তথ্যসূত্র :

১। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৬, পৃ. ৪৪৮

২। ড. দেবাশিস পাল, সমকালীন ভারত ও শিক্ষা, রীতা পাবলিকেশন, পৃ. ৩৭৪
৩। ভক্তিভূষণ ভক্তা, ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ-আ-ক-খ প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৫